শেষপাতে মিষ্টি কেন?

ডাঃ কিংশুক দাস

এই তো এসে গেল গাজনের মেলা। গত বছর গাজনের মেলার সময় গোপালপুরের গোবিন্দবাবুর গেস্ট হয়ে গিয়েছিলাম। রাত্রে খেতে বসে তো সে এলাহি কাণ্ড! বাড়ির গিন্নিমা খাবার শেষে একের পর এক বিভিন্ন ধরনের মিষ্টির পদ দিতেই থাকলেন। আমি প্রচণ্ড লোভী হলেও আর পেরে উঠছিলাম না। গিন্নিমা বলে উঠেছিলেন, 'বাবা শেষপাতে এইটুকু মিষ্টি খাবে না?' আজ লিখতে বসে সেদিনের ওই দৃশ্যটা চোখের সামনে ঝলমল করে উঠল।

মিষ্টির প্রতি এই আম-বাঙালির দুর্বলতাটা পৃথিবী বিখ্যাত। আর মিষ্টির প্রতি মোহটা তো জন্মগত। ইতিহাসবিদ্‌রা বলেন, গৌড়বঙ্গ নামটা গুড় থেকেই এসেছে। কারণ সেই সময় বাংলায় প্রচুর পরিমাণে গুড় তৈরি হত আর বাঙালিরাও গুড় খেতে ভালবাসতেন। এ বঙ্গে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি ১৮৫০ সালের পর থেকেই সহজলভ্য হয়ে উঠেছিল। এর আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। গোয়ালাদের অনেকটা দুধই অবিক্রীত থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। এই ক্ষতি থেকে বাঁচতেই ছানার সৃষ্টি। আর তারপরটা পুরোটাই ইতিহাস। ভীমনাগ, নবীনচন্দ্র দাস, দ্বারিক ঘোষ, গাঙ্গুরাম চৌরাসিয়া আর বলরাম মল্লিকের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টির স্বাদ পাই আমরা। রানী রাসমণি, ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং আশুতোষ স্যর সবাই ভীমনাগের মিষ্টির ভক্ত ছিলেন। আর লেডি ক্যানিং (লর্ড ক্যানিংয়ের স্ত্রী)-এর জন্মদিনের মিষ্টির অর্ডার পেয়ে ভীমনাগবাবু যে মিষ্টি বানান তাকেই আমরা আজ চিনি 'লেডি কিনি' (লেডি ক্যানিংয়ের নামানুসারে) নামে। এ তো গেল বাঙালির মিষ্টি প্রীতির কিছু কথা। এর সঙ্গে শেষ পাতে মিষ্টির সম্পর্কটা বুঝলেন না তো? চলুন একটু ফ্ল্যাশ ব্যাকে চলে যাই ১৬০০ সালের দিকে।

স্থান– ইউরোপ, কাল– সপ্তদশ শতাব্দী, অনুষ্ঠান– সামাজিক (বিয়ে, সেলিব্রেশন)। এসময়ই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অল ইভিনিং এবং অল নাইট পার্টি শুরু হয়। হোস্ট বা নিমন্ত্রণকর্তার মাথায় একটা জিনিসই কাজ করত, যে সবাই যেন পেট ভরে খান এবং খুশিতে বাড়ি যান। তাঁকে আরেকটা দিকও ভাবতে হত যে তাঁর কর্মচারী এবং রান্নার লোকেরা যেন কাজের শেষে তাড়াতাড়ি এবং ঠিকঠাক বাড়ি পৌঁছতে পারে। তার জন্য এমন একটা খাবারের কথা ভাবা হল যেটা শেষপাতে পরিবেশন করা হবে, যেটা পেট ভরিয়ে দেবে, ক্যালরির জোগান দেবে এবং মনেও শান্তি আনবে। অথচ, বানাতে সময় লাগবে না। সূচনা হল নতুন খাবার ডেজার্টের। এই 'ডেজার্ট' কথাটির উৎপত্তি ফ্রেঞ্চ শব্দ 'দেজার্ভির' থেকে। এই 'দেজার্ভির' কথাটির অর্থ– 'টু রিমুভ হোয়াট হ্যাজ বিন সার্ভড (ক্লিন দি টেবিল)।' এই টেবিল পরিষ্কার করতে গিয়ে ডেজার্ট খাবারটা দেওয়া হত, তাই ইংরেজিতে একে বলা হত, 'থিংস টু ইট, হোয়াইল ক্লিয়ারিং দি টেবিল আফটার দি মিলস্।' আমরা ৪০০ বছর পরেও ডেজার্ট এভাবেই খেয়ে থাকি। আমেরিকাতেও ১৮০০ সালের দিকে এই ডেজার্ট ছড়িয়ে পড়ে। ডেজার্ট হিসেবে ফ্রুটস, নাটস, বিভিন্ন ধরনের মিষ্টির পদ সারা পৃথিবী জুড়েই চলে আসছে। এই বঙ্গেও শেষ পাতে মিষ্টির সূচনা এইভাবেই ডেজার্ট হিসেবে।

এবার এই শেষপাতে মিষ্টির গুণগুলো একটু দেখে নিই, যা ওই গোপালপুরের গিন্নিমার তৃপ্তিভরা মুখটা আবার মনে করিয়ে দেবে–

✦ শেষপাতে মিষ্টি চলে আসছে ট্র্যাডিশন হিসেবে এবং এটা অনেকটা বিদেশি আদবকায়দার প্রতিফলনও

✦ বাড়িয়ে তোলে সার্বিক হৃদ্যতা এবং বন্ধন, যাকে সেলিব্রেশনেরও এক রূপ বলা চলে। যিনি খাচ্ছেন তিনি তো আনন্দ পাচ্ছেনই, আর যিনি শেষপাতে মিষ্টি দিচ্ছেন তাঁরও মানসিক শান্তিটা একবার ভাবুন তো! ভুললে চলবে না শেষ ভাল যার সব ভাল তার

✦ বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় জানা গেছে, শেষপাতে মিষ্টি ব্রেনে সেরোটোনিন বাড়িয়ে সার্বিক মানসিক তৃপ্তির জোগান দেয়

✦ পরিমিত পরিমাণে মিষ্টি যে পরিমাণ ক্যালরির জোগান দেয় তা নিশ্চয়ই আমাদের শরীরের কোষের দৈনন্দিন কাজকর্মের উপকারে আসে

✦ আর জানেন তো আমাদের বাঙালিদের খাবারের শেষপাতে মিষ্টির প্রতি কেমন যেন অনিয়ন্ত্রিত আকর্ষণ থাকে। শেষপাতে মিষ্টি পরিবেশন করে হোস্ট বা নিমন্ত্রণকর্তাও বোধহয় ওই আকর্ষণেরই সমাপ্তি দেখতে চান

দেখলেন তো লিখতে লিখতে কোথায় চলে এলাম। **চলুন দেখি মিষ্টির প্রতি এই আকর্ষণ কেন আসে আমাদের?**

✦ পারিবারিক ট্র্যাডিশন খাবার শেষে মিষ্টি খাওয়া। বাচ্চা যদি ছোটবেলা থেকে এর খপ্পরে পড়ে তাহলে তাদের মুক্তি নেই। যে গুরুজনেরা বাচ্চাকে পড়াশোনা করা বা সবজি খাওয়ার জন্য ঘুষ হিসেবে শেষপাতে মিষ্টি দেন তাঁদেরই বা বাদ দিই কী করে! সে বাচ্চা বড় হয়ে শেষ পাতে মিষ্টি চাইলে অবাক হওয়ার কি কিছু আছে?

✦ আগেই বলেছি মিষ্টি সেরোটোনিন লেভেলকে বাড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি দেয়। তাই যখন

সেরোটোনিন কমে (ডিপ্রেশনে, শীতকালে, পিরিয়ডের সময় ইত্যাদি) তখনই শেষপাতে একটু বেশি মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করে। যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত পরে করতে হয় (এ প্রসঙ্গে পরে আসছি)

✦ কিছু মানুষের প্রধান মিলে বা খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট বেশি থাকে। হাই-গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যুক্ত খাবার খেলে (হোয়াইট ব্রেড, হোয়াইট রাইস) তৎক্ষণাৎ রক্তে সুগার বেড়ে যায়। আবার তা খুব তাড়াতাড়ি নেমেও যায়। একে রিঅ্যাকটিভ হাইপোগ্লাইসিমিয়া বলে। এঁদের খাওয়া শেষ হওয়ার ৩০ মিনিটের মধ্যে আবার মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়

নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন প্রত্যেকের বাড়িতে এমন কেউ আছেন যাঁরা শেষপাতে মিষ্টি খেয়ে আবার ফ্রিজ খুলে মিষ্টি দই, পায়েস এবং চকোলেট খেয়ে নেন। ভয় নেই, আমিও এই গ্রুপেই পড়ি। আমিও ভুক্তোভোগী বলেই **চলুন দেখে নিই মিষ্টির প্রতি এই আকর্ষণটাকে কীভাবে আটকে রাখব–**

✦ বুঝে নিই কোনটা সত্যিকারের প্রয়োজনীয় আর কোনটা খেতে ভীষণ ইচ্ছা করছে। ইচ্ছা বাদ দিয়ে প্রয়োজনটুকুই খান। অভ্যাসটাকে বদলাতেই হবে। আর মনে রাখতে হবে চেষ্টা করলে এই আকর্ষণটা বদলাতে ১–২ মাস সময় লাগবে

✦ হাই-গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যুক্ত খাবারের পরিবর্তে পারলে লো-গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যুক্ত খাবার যথা– ব্রাউন ব্রেড, ব্রাউন রাইস, শাকসবজি, নতুন আলু, রাঙা আলু, বিনস, বরবটি, মটরশুঁটি আর ফল খান। খাদ্যে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন (মাছ, মাংস, ডিম, ছানা, পনির, ডাল ইত্যাদি) থাকে। এই ব্যালেন্সড খাবার খেলে রিঅ্যাকটিভ হাইপোগ্লাইসিমিয়া হয় না। আর তাই সুগার বা মিষ্টির প্রতি আকর্ষণটা কমে যায়

✦ দ্বিতীয়বার শেষপাতে মিষ্টি না নেওয়া, মিষ্টি খাওয়ার পর তাড়াতাড়ি ব্রাশ করে নেওয়া, মিষ্টি যেখানে রাখা আছে তার আশপাশে না যাওয়া এবং পারলে বাইরে একটু হাঁটতে চলে যাওয়া

✦ চেষ্টা করতে হবে মিষ্টি ফল খেয়ে মিষ্টির প্রতি তীব্র আকর্ষণটা কমানোর

✦ স্ট্রিক্ট ডায়েটিং বন্ধ করতে হবে। নিজেকে শেষপাতে মিষ্টি খাওয়া থেকে বঞ্চিত করলে চলবে না। সপ্তাহে একদিন মিষ্টি ডেজার্ট খাওয়াই যাবে

✦ একসঙ্গে বাড়িতে অনেক মিষ্টি কিনে রাখবেন না

✦ আর যখন বুফেতে খাচ্ছেন তখন সবচেয়ে ছোট প্লেটটা হাতে নিয়ে মিষ্টির কাউন্টারে লাইন দিন

আর এই শেষপাতে বেশি মিষ্টির পরিণতি তো আপনারা সকলেই জানেন। এমনিতেই সারা পৃথিবীতে চলছে স্থূলতার এপিডেমিক। আর ভারতবর্ষ হল ডায়াবেটিসে পৃথিবীর রাজধানী। সত্যি কথা বলতে কী, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিধান অনুযায়ী, ছেলেরা সারাদিনে সর্বোচ্চ ৯ চামচ ও মেয়েরা সর্বোচ্চ ৬ চামচ চিনি খেতে পারেন। তাই শেষপাতে বেশি মিষ্টি খেয়ে ওজন বাড়িয়ে, ডায়াবেটিসকে ডেকে এনে, রক্তের প্রেশার বাড়িয়ে, হার্টের ইস্কিমিয়া করে, অ্যাসিডিটি গ্যাস-ঢেকুর বাড়িয়ে, লিভারের সিরোসিসের সূচনা করে আর সর্বোপরি শরীরে ক্যান্সার তরান্বিত করে লাভটা কী? তাই আবারও যাব গাজনের মতো অনেক মেলায়, অনেক পরিবার, অনেক বন্ধুবান্ধবের অনুষ্ঠান বাড়িতে। নিজের বাড়ি তো আছেই। শেষপাতে মিষ্টি নিজেও খাব আর অন্যদেরও খাওয়াব। সুদৃঢ় করব সামাজিক বন্ধন। বাড়িয়ে তুলব ভালবাসার টি আর পি-কে। কিন্তু ছোট্ট মাথায় একটু খেয়াল রাখব, শেষপাতের মিষ্টি যেন কখনই লাগামছাড়া না হয়ে যায়।

সহায়তা: **প্রীতিময় রায়বর্মন**

ডাঃ কিংশুক দাস

এম ডি, ডি এম, এফ এ এস জি ই (আমেরিকা), এফ এস জি ই আই (ভারত)। চণ্ডীগড়-এর পি জি আই এম ই অ্যান্ড আর থেকে মেডিসিন-এ এম ডি (১৯৯১) এবং গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিতে ডি এম (১৯৯৪)। ফেলো, আমেরিকান সোসাইটি অফ জি আই এন্ডোস্কোপি। ফেলো, সোসাইটি অফ গ্যাস্ট্রো-ইন্টেস্টিনাল এন্ডোস্কোপি অফ ইন্ডিয়া। বর্তমানে তিনি দেশের অন্যতম সিনিয়র গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট, হেপাটোলজিস্ট ও ইন্টারন্যাশনাল এন্ডোস্কোপিস্ট। তিনি কলকাতার রুবি জেনারেল হাসপাতালের ডিভিশন অফ গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজির প্রধান। ভিজিটিং কনসালট্যান্ট হিসেবে যুক্ত আছেন রুবি জেনারেল হাসপাতাল, আমরি হাসপাতাল ও পাল্‌স ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ: ৯৯০৩৬-২৯৭৪২ ও ৯৮৩০০-৫৩৩৭৭ (এস এম এস), ই-মেল: kinsuk119@yahoo.com। ওয়েবসাইট: www.drkinsukdas.in

কনক অপটিক্যাল

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
কম্পুটারচালিত চক্ষু পরীক্ষা
চশমা ও কন্টাক্টলেন্স

রামরাজাতলা স্টেশন রোড, রামরাজাতলা, হাওড়া - ৪, ফোন ঃ ২৬২৭ ০৮৪১, ৯৮৭৪৫৭৮৮২১